আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টচত্বারিংশ গ্রন্থ

ছবি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাঘ—১৩২৬

উপহার

ছবি

১

এই কাহিনী যে সময়ের, তখনও ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই। তখনও তাহার নিজের রাজারাণী ছিল, পাত্র-মিত্র ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল; তখন পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিত।

মান্দালে রাজধানী, কিন্তু রাজবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন সহরে গিয়া বসবাস করিতেন।

এমনিই বোধ হয় একজন কেহ বহুকাল পূর্ব্বে পেগুর ক্রোশ পাঁচেক দক্ষিণে ইমেদিন গ্রামে আসিয়া বাস করিয়া-ছিলেন।

তাঁদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকা-কড়ি, মস্ত জমীদারী। এই সকলের মালিক যিনি, তাঁর একদিন যখন পরকালের ডাক পড়িল, তখন বন্ধুকে ডাকিয়া

কহিলেন, বা-কো, ইচ্ছা ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। কিন্তু সে সময় হইল না। মা-শোয়ে রহিল, তাহাকে দেখিও।

ইহার বেশী বলার তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। বা-কো তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। একদিন তাহারও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল, শুধু ফয়ার মন্দির গড়াইয়া আর ভিক্ষু খাওয়াইয়া আজ কেবল সে সর্ব্বস্বান্ত নয়, ঋণগ্রস্ত। তথাপি এই লোকটিকেই তাঁহার যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকে নির্ভয়ে সঁপিয়া দিতে এই মুমূর্ষুর লেশমাত্র বাধিল না। বন্ধুকে চিনিয়া লইবার এত বড় সুযোগই তিনি এ জীবনে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব বা-কোকে অধিক দিন বহন করিতে হইল না। তাঁহারও ও-পারের শমন আসিয়া পৌঁছিল, এবং সেই মহামান্য পরওয়ানা মাথায় করিয়া বৃদ্ধ বৎসর না ঘুরিতেই যেখানের ভার সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া অজানার দিকে পাড়ি দিলেন।

এই ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র লোকটিকে গ্রামের লোক যত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, তেমনি প্রচণ্ড আগ্রহে তাহারা ইহার মৃত্যু-উৎসব সুরু করিয়া দিল।

বা-কোর মৃতদেহ মাল্য-চন্দনে সজ্জিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান রহিল, এবং নীচে খেলা-ধূলা, নৃত্য-গীত ও আহার-বিহারের স্রোত রাত্রি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল, ইহার বুঝি আর শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকট আনন্দ হইতে ক্ষণকালের জন্য কোন মতে পলাইয়া বা-থিন একটা নির্জ্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, মা-শোয়ে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ওড়নার প্রান্ত দিয়া নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল, এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।

২

বা-থিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া রাজার দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং খুশী হইয়া রাজ-হস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী পুরস্কার করিয়াছেন।

আনন্দে মা-শোয়ের চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, বা-থিন, জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-থিন হাসিল, কহিল, বাবার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

উত্তরাধিকারসূত্রে মা-শোয়েই এখন তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ কথায় সে সকলের চেয়ে বেশি লজ্জা পাইত। বলিল, তুমি বার বার এমন করিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।

বা-থিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণের দায়ে পিতার মুক্তি হইবে না, এত বড় বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন শিহরিয়া উঠিল।

বা-থিনের পরিশ্রম আজ কাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। জাতক হইতে একখানা নূতন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোয়ে প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। বা-থিনের শোবার ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া দিয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-থিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-থিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এতদিন দেশের রাণী হইতে পারিতে।

বা-থিন মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, কেন বল ত?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁর অনেক রাণী, কিন্তু এমন রঙ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁদের কারও আছে?

এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-থিনের মনে

পড়িতে লাগিল মান্দালেতে সে যখন ছবি আঁকা শিখিতেছিল, তখনও এম্‌নি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্ব্বল, নারীর মত কোমল, তাদের মতই সুন্দর,—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড় ছোট মনে করিত।

৩

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমেদিন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়-দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামান্তের মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-থিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

মা-শোয়ে কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ। বা-থিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজসজ্জা কিসের?

বাঃ, তোমার বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়-দৌড়? যে জয়ী হইবে, সে তো আজ আমাকেই মালা দিবে!

কই, তা তো শুনি নাই, বলিয়া বা-থিন তাহার তুলিটা পুনরায় তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ নেই-নেই। কিন্তু তুমি ওঠ,—আর কত দেরী করিবে?

এই দুটিতে প্রায় সমবয়সী,—হয় ত বা-থিন দুই চারি

মাসের বড় হইতেও পারে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এম্‌নি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে,—আর ভাল-বাসিয়াছে।

সম্মুখের প্রকাণ্ড মুকুরে ছুটি মুখ ততক্ষণ ছুটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বা-থিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ ছুটি ছবির পানে অতৃপ্ত-নয়নে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় সুন্দর। আবেশে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল, কানে-কানে বলিল, আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক। বা-থিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তুমি চাঁদের কলঙ্ক নও, তুমি কাহারো কলঙ্ক নও,—তুমি চাঁদের কৌমুদীটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু নয়ন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেম্‌নি দু'চক্ষু মুদিয়া রহিল।

হয় ত এমনি করিয়াই বহুক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নর-নারীর দল নাচিয়া গাহিয়া সুমুখের পথ দিয়া

উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, সময় হইয়াছে।

কিন্তু আমার যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব মা-শোয়ে।

কেন ?

এই ছবিখানি পাঁচ দিনে শেষ করিয়া দিব চুক্তি করিয়াছি।

না দিলে ?

সে মান্দালে চলিয়া যাইবে, সুতরাং ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

টাকার উল্লেখে মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ করিত। রাগ করিয়া বলিল, কিন্তু তা' বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে দিতে পারি না।

বা-থিন এ কথার কোন উত্তর দিল না। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া তাহার মুখের উপর যে ম্লান ছায়া পড়িল, তাহা আর একজনের দৃষ্টি এড়াইল না।

কহিল, আমাকে বিক্রী করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-থিনের তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু করিবে কি ?

মা-শোয়ে গলার বহুমূল্য হার দেখাইয়া বলিল, ইহাতে যতগুলি মুক্তা, যতগুলি চুণি আছে, সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাঁধাইব, তার পরে শোবার ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তার পরে?

তার পরে যে দিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তার জ্যোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে—

তার পরে?

তার পরে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নীচে মা-শোয়ের গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার গাড়োয়ানের উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল।

বা-থিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, তার পরের কথা পরে শুনিব, কিন্তু আর নয়। তোমার সময় হইয়া গেছে,—শীঘ্র যাও।

কিন্তু সময় বহিয়া যাইবার কোন লক্ষণ মা-শোয়ের আচরণে দেখা গেল না। কারণ, সে আরও ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে, আমি যাবো না।

যাবে না? কথা দিয়াছ, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তা জানো?

মা-শোয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করুক। চুক্তি-ভঙ্গের অত লজ্জা আমার নাই,—আমি যাবো না।

ছিঃ—

তবে তুমিও চল?

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু, তাই বলিয়া আমার জন্য তোমাকে আমি সত্য ভঙ্গ করিতে দিব না। আর দেরি করিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, তুমি নিজের সুবিধার জন্য আমাকে দূর করিতে চাও। দূর আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না।

এক মুহূর্ত্তে বা-থিনের কর্ত্তব্যের দৃঢ়তা স্নেহের জলে গলিয়া গেল, সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, এতবড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে,—আমি জানি, ইহার শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেম্‌নি বিষণ্ণ মুখেই উত্তর দিল,—আমি না আসিলে খাওয়া-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জানো বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে।

এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত-পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪

প্রায় অপরাহ্ণ-বেলায় মা-শোয়ের রূপা-বাঁধানো 'ময়ূর-পঙ্খী' গো-যান যখন ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহুমানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পরে যে ভাগ্যবান্ এই রমণীর শিরে জয়মাল্যটি সর্ব্বাগ্রে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্টই আজ যেন জগতে হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোষাকে সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কষ্টে সংযত করিয়াছিল। দেখিলে মনে হয়, আজ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ সময় আসন্ন হইয়া আসিল, এবং যে কয় জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল,

এবং ক্ষণেক পরেই ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কয় জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বীরত্ব, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃ-পিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্মত্ত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্দ্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই ভিন্ন-গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক যখন আরক্ত-দেহে, কম্পিত-মুখে, ক্লেদ-সিক্ত হস্তে শিরে তাহার জয়মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পার্শ্বে গাড়ীতে স্থান দিল, এবং সজল কণ্ঠে কহিল, আপনার জন্য আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছিল, অত বড় উঁচু প্রাচীর, কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়!

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল, কিন্তু এই অসমসাহসী বলিষ্ঠ বীরের সহিত মা-শোয়ে মনে-মনে তাহার সেই দুর্ব্বল,

কোমল ও সর্ব্ববিষয়ে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো-থিন। কথায় কথায় পরিচয় হইলে জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর-আত্মীয়।

মা-শোয়ে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহুলোক ভিড় করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোত্থিত ধূলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহার বাটীর সুমুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত বা-থিন তাহার কাজ ফেলিয়া জানালায় আসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

৫

সান্ধ্য-ভোজের প্রসঙ্গে পরদিন মা-শোয়ে বা-থিনকে কহিল, কাল সন্ধ্যাটা বড় আনন্দে কাটিল। অনেকেই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে শেষ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, ভালই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

বিস্ময়ে মা-শোয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভারে তাহার পেট ফুলিতেছিল, কাল বা-থিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আর অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প করিবে মনে করিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উল্টা রকমের হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আলাপের কাজ চলে না, তাই সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে সকল ছোটখাটো কাজগুলি সে

করিয়া যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল,—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,—একবার বা-থিন মুখ তুলিল না, একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশমাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমনি অবসর নাই।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আজ আমি আসি।

বা-থিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাবার সময় মা-শোয়ের মনে হইল, যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা করে, একবার সে ইচ্ছাও হইল বটে, কিন্তু মুখ খুলিতে পারিল না, নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

বাটীতে পা দিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। গত রাত্রির আনন্দ-উৎসবের জন্য সে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-শোয়ে যত্ন করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথমে মা-শোয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিল, পরে

তাহার বংশের কথা, তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাঁহার রাজদ্বারে সম্ভ্রমের কথা, এমনি কত কি সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অন্যমনস্ক কানে পৌঁছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত। মা-শোয়ের এই ঔদাসীন্য তাহার অগোচর রহিল না। সে মান্দালের রাজ-পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে যখন সৌন্দর্য্যের আলোচনা সুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য করিয়া বারংবার তাহার রূপ ও যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিল না।

এবং আলাপ শেষ হইলে পো-থিন যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জন্যও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে তাহার কথাগুলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল,

এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জন্য বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন, এবং আজও অনেক হাসি-তামাসা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্য-গীতের সঙ্গে যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সে শুইতে গেল; কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিস্ময় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে সকল যেন কত যুগের পুরাণো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—এম্‌নি শুষ্ক, এম্‌নি বিরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যান-প্রান্তের একটা নির্জ্জন গৃহে এখন নির্ব্বিঘ্নে আছে,—আজিকার এত বড় মাতা-মাতির লেশমাত্রও যাহার কানে যাইবার হয় ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।

৬

চিরদিনের অভ্যাস প্রভাত হইতেই মা-শোয়েকে টানিতে লাগিল। আবার সে গিয়া বা-থিনের ঘরে আসিয়া বসিল। প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা 'এসো' বলিয়াই তাহার সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল, কিন্তু কাছে বসিয়াও আর এক জনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কর্ম্মনিরত নীরব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকি কত ?

অনেক।

তবে, এই দু'দিন ধরিয়া কি করিলে ?

বা-থিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা-শোয়ে এই ইঙ্গিত বুঝিল। জ্বলিয়া উঠিয়া হাত দিয়া বাক্সটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকালবেলা চুরুট খাই না,—চুরুট দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই,—আমি ছোট লোকের মেয়ে নই।

বা-থিন মুখ তুলিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, হয় ত তোমার জামা-কাপড়ে কোনরূপে লাগিয়াছে। মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা-শোয়ে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি যেমন নীচ, তেম্‌নি হিংসুক, তাই আমাকে বিনা দোষে অপমান করিলে! আচ্ছা, তাই ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমার ঘর থেকে আমি চিরকালের জন্ম সরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-থিন পিছনে ডাকিয়া তেমনি সংযত স্বরে বলিল, আমাকে নীচ ও হিংসুক কেহ কখনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃ-পথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃ-পথে কি করিয়া গেলাম?

তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো, কিন্তু যাহার পিতা আশীর্ব্বাদ রাখিয়া গেছেন, সন্তানের জন্ম অভিশাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-থিন স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কেহ যে কোন কারণেই কাহাকে এমন মর্ম্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে পারে, এত ভালবাসা একদিনেই যে এত বড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সে ভাবিতেও পারিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর করিয়া একটু হাস্য করিল।

হাসি দেখিয়া মা-শোয়ের দুই ভ্রূ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল! কহিল, আপনার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

না, প্রয়োজন এমন—

তা' হ'লে আমার সময় হবে না, বলিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একবারে হত-বুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা সুমুখে আসিতেই কাষ্ঠ-হাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

৭

শিশুকাল হইতে যে দুই জনের কথনও এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাসাধিককাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা-শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালই হইল যে, যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। এই ধনীর কন্যার নবীন উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিদ্যমানেও অনেক দিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে, যাহা কেবলমাত্র গম্ভীর ও সংযতচিত্ত বা-থিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন,—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদীহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া, অনেক ভাঙা-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জন্যও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই, সেখানে কি আছে! দেখিলে দেখিতে পাইত, এতদিন শুদ্ধ-

মাত্র সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখী বসিয়া আছে,—প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না;—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রজনীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল,—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না।

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমন করিয়া কাটিতে চাহিল না। কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতিবৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজনটাই কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত হইতেছিল। বাটীর দাস-দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে। কেবল তাহার নিজেরই যেন কিছুতে গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া যেন এতদিন তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত,

সেও মানুষ,—সেও ঈর্ষ্যার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের অপর্য্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্ত্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয় ত বা সে তাহার তূলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থির হইয়া বসে, কখনও বা অস্থির দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নিদ্রাবিহীন তপ্তশয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও বা—কিন্তু থাক্ সে সব।

কল্পনায় এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল কিছুই না,—কিছুই না। তাহার কোন কাজেই তাহার কোন বিঘ্ন ঘটায় না। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ফাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না,—ধরা দিতেও চাহে না। ওই কেমন দুর্ব্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল হইয়া গেছে,—কোথাকার কোন ঝঞ্ঝাই আর তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি জন্মতিথি উৎসবের বিরাট্ আয়োজন আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-থিন আজ সর্ব্বত্র, সকল

কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কানা-ঘুষাও চলিতেছিল যে, একদিন এই লোকটাই এ বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া উঠিবে,—এবং বোধ হয়, সে দিন বড় বেশী দূরেও নয়।

গ্রামের নরনারীতে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গেছে,—চারিদিকেই আনন্দ-কলরব। শুধু যাহার জন্য এই সব, সেই মানুষটিই বিমনা,—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো চখেই প্রায় পড়িল না,—পড়িল কেবল বাটীর দুই এক জন সাবেক দিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধ হয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্ব্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে লোক নাই, সে মালা নাই, সে আশীর্ব্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোট মা, কই তাকে ত দেখি না?

বুড়া কিছুকাল পূর্ব্বে কর্ম্মে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঘরও অন্য গ্রামে,—এই মনান্তরের খবর সে জানিত

না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-শোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল, দেখিবার দরকার থাকে, তার বাড়ী যাও,—আমার এখানে কেন?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁকে একাকী দেখিলেই ত চলিবে না—তোমাদের দু'জনকে আমার একসঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচর রহিল না। সেই অবধি একপ্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা গলার অস্ফুট শব্দে চাহিয়া দেখিল—বা-থিন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; কিন্তু চক্ষের নিমিষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোট-মা, যাই হোক্, তোমার অতিথি! একটা কথাও কি কহিতে নাই?

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই।

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গেছে, বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত,

আমি ছাড়া আরও ত লোক আছে, তাঁরা ত কথা বলিতে পারেন!

বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু আর আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গেছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল। নইলে তুমিও ত তাঁকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে।

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৮

এই অপমানে বা-থিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন দুই পরে টের পাইল। আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে লজ্জা সারাজীবনে কোথায় রাখিবে, তাহার কূল-কিনারা দেখিল না।

যে ছবিটার কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, জাতকের সেই গোপার চিত্রটা এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে। একমাসের অধিক কাল অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজদরবারে যাইবে, যিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ

উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-থিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন?

তার কারণ এ মুখ আমি চিনি। মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান করা হয়। এ কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার মুখ দেখিবেন না।

এই বলিয়া সে চিত্রকরের বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না।

বা-থিনের চোখের উপর হইতে ধীরে-ধীরে একটা কুয়াসার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল,—আর তাহার বুঝিতে বাকি নাই, এত দিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে সৌন্দর্য্য, যে মাধুর্য্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে,

দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে,—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই মা-শোয়ে।

চোখ মুছিয়া মনে-মনে কহিল, ভগবান্! আমাকে এমন করিয়া বিড়ম্বিত করিলে,—তোমার আমি কি করিয়াছিলাম!

৯

পো-থিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও কামনা করেন, মা-শোয়ে, আমি ত মানুষ।

মা-শোয়ে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে করে না, সে বোধ হয় তবে দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শুনিয়াছি, দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে,—আমার একটা কাজ করিয়ে দিতে পারেন? খুব শীঘ্র?

পো-থিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

এক জনের কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিতে পারি না। কোন দলীল নাই। আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজকর্ম্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা হাসিল।

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে দিন একটি

উপায় করিয়া। আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব করিতে চাই না।

পো-থিন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই।

এই ঋণটা চিরদিন এত তুচ্ছ, এত অসম্ভব, এতই হাসির কথা ছিল যে, এ সম্বন্ধে কেহ কখনো চিন্তা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীর মুখের আশায় মা-শোয়ের সমস্ত দেহ এক মুহূর্ত্তে উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; সে দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিল—আমি কিছুই ছাড়িয়া দিব না,—একটা কড়ি পর্য্যন্ত না। জোঁক যেমন করিয়া রক্ত শুষিয়া লয়, ঠিক তেম্‌নি করিয়া। আজই—এখনই হয় না?

এ বিষয়ে এই লোকটাকে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা তাহার আশার অতীত। সে ভিতরের আনন্দ ও আগ্রহ কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, রাজার আইন অন্ততঃ সাত দিনের সময় চায়। এ সময়টুকু কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তাহার পরে যেমন করিয়া খুসী, যত খুসী রক্ত শুষিবেন, আমি আপত্তি করিব না।

সেই ভাল। কিন্তু এখন আপনি যান। এই বলিয়া সে একপ্রকার যেন ছুটিয়া পলাইল।

এই দুর্ব্বোধ মেয়েটির প্রতি লোকটির লোভের অবধি ছিল না। তাই অনেক অবহেলা সে নিঃশব্দে পরিপাক করিত, আজিও করিল। বরঞ্চ, গৃহে ফিরিবার পথে আজ তাহার পুলকিত চিত্ত পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, আর ভয় নাই,—তাহার সফলতার পথ নিষ্কণ্টক হইতে আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব হইবে না। বিলম্ব হইবে না, সে কথা সত্য। কিন্তু কত শীঘ্র এবং কত বড় বিস্ময় যে ভগবান্ তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কথা আজ কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১০

ঋণের দাবীর চিঠি আসিল। কাগজখানা হাতে করিয়া বা-থিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই জিনিসটি সে আশা করে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যও হইল না। সময় অল্প, শীঘ্র কিছু একটা করা চাই।

একদিন নাকি মা-শোয়ে রাগের উপর তাহার পিতার অপব্যয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার এ অপরাধ সে বিস্মৃতও হয় নাই, ক্ষমাও করে নাই। তাই সে সময়ভিক্ষার নাম করিয়া আর তাঁহাকে অপমান করিবার কল্পনাও করিল না। শুধু চিন্তা এই যে, তাহার যাহা কিছু আছে, সব দিয়াও পিতাকে ঋণমুক্ত করা যাইবে কি না। গ্রামের মধ্যেই এক জন ধনী মহাজন ছিল। পরদিন সকালেই সে তাহার কাছে গিয়া গোপনে সর্ব্বস্ব বিক্রী করিবার প্রস্তাব করিল। দেখা গেল, যাহা তিনি দিতে চাহেন, তাহাই যথেষ্ট। টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিল, কিন্তু এক জনের অকারণ হৃদয়-হীনতা যে তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর অজ্ঞাতসারে কত বড় আঘাত দিয়াছিল, ইহা সে জানিল তখন, যখন জ্বরে পড়িল।

কোথা দিয়া যে দিন-রাত্রি কাটিল, তাহার খেয়াল রহিল না। জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই দিনই তাহার মেয়াদের শেষ দিন।

আজ শেষ দিন। আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া মা-শোয়ে কল্পনার জাল বুনিতেছিল। তাহার নিজের অহঙ্কার অনুক্ষণ ঘা খাইয়া খাইয়া আর এক জনের অহঙ্কারকে একেবারে অভ্রভেদী উচ্চ করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। সেই বিরাট অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটীর সঙ্গে মিশিবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নীচে বা-থিন অপেক্ষা করিতেছে। মা-শোয়ে মনে মনে ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নীচে আসিতেই বা-থিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বুকে শেল বিঁধিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কাণাকড়ির নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত বড় ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে আজ এই দেখিল। বা-থিন

প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাত দিনের শেষ দিন, তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে, মানুষ মরিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে, প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারিল যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-থিনের পীড়িত, শুষ্ক মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকাই আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পেলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাক্সটায় টাকা আছে, কাহাকেও গণিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বিলম্ব হইবে? বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেগুতে রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে না!

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাক্স, বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গো-যান দাঁড়াইয়া। ভয়ে

চক্ষের নিমিষে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যাকুল হইয়া একেবারে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল,—পেগুতে কে যাবে? গাড়ী কার? কোথায় এত টাকা পেলে? চুপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুক্‌নো কিসের জন্য? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার—

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল—উঃ—এ যে জ্বর, তাই ত বলি, মুখ অত ফ্যাঁকাসে কেন?

বা-থিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, বোস। বলিয়া সে নিজেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে। বা-থিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ, সৎ দেখিয়া কাহাকেও শীঘ্র বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশি দিন থাকিও না। আর একটা কথা—

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিস তোমাকে চিরকাল মনে রাখিতে বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে, লজ্জার মত অভিমানও স্ত্রীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে—

মা-শোয়ে অধীর হইয়া মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও সব আর এক দিন শুনিব। টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো?

টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন ঢোক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ হইয়াছে—নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে-ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্, ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে যাইতেই হইবে।

এই জ্বর লইয়া? এ কি তুমি সত্যই বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব?

এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া আবার তাহার হাত ধরিল। এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা এক মুহূর্ত্তেই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান কিছুরই চিহ্ন-মাত্র নাই। আছে শুধু বিরাট্ স্নেহ ও তেম্‌নি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল, সে নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিল, দুটি সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি কি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মান্দালের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও

আমি ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিলাম।

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিলাসী*

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহার হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে-ছেলেদের সকালে আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়,—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া

---

* জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরি হইতে নকল। তার আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই,—নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন, ন্যাড়া।

ইস্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগ্য বালকদের মা সরস্বতী খুসি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান,—তাঁদের চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দ্দশা হয়না!

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক্, কিন্তু ঐ চার-ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এ সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই,—

দু ক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু তিন খানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে সুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর পাড়ের খেজুর মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে না সোনা মেলে—এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলেনা।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ।—এবং, আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বিলাসী

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।—তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না; ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান আর তার মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ী; আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার একটা কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এম্‌নি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্দ্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত ; এবং ভাল করিয়াই চলিত। যে দিন দেখা হইয়াছে সেই দিনই দেখিয়াছি মৃত্যুঞ্জয় ছেঁড়া খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারো সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ কথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল মাল-পাড়ার

এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়ো বাড়ীতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্ ধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায় বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে—বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক্ খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানীতে

জল দিয়া জিয়াইয়া-রাখা বাসি ফুলের মত! হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে!

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে হ্যাড়া?

বলিলাম—হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বোসো।

মেয়েটি ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল তাহার মর্ম্ম এই যে প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে। এবং যদিচ, এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলে মানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে, এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার! দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা কত শুশ্রূষা কত ধৈর্য্য কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ!

কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়া ছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্য্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্য্যন্ত তোমাকে রেখে আস্‌ব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতে ছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং, মনে যাই থাক্ প্রত্যুত্তরে শুধু একটা "না" বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল,—বন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য, এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্য্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময়ই পাইলাম না। কেবলই মনে হইতে লাগিল একটা মৃত-কল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন! মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোন মুহূর্ত্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে

পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি,—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপা-দাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্দ্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলেনা! পাড়ায় খবর দেওয়া চাই,—অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই যা হবার সেতো হইয়াছে, আর বাহিরে গিয়া কি হইবে? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক্ কাজ,—তুমি বোসো।

বলিলাম, বসিলে চলিবে না, একবার খবর দিতেই হইবে, বলিয়া পা বাড়াইবা মাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃত-দেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও স্ত্রীর সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানোও আমার উদ্দেশ্য নহে কিম্বা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিম্বা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্ত্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া এক সঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়ে-

মানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধানই পায়না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক্, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া কোনমতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিম্বা ওই রেলগাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড় অসুখটা চোখে দেখে আসিয়াও মাস দুই আর তার খবরই নাই? তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানিনা তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না,

কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তবে তাহার সরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই তখন সে যে বাঁচিয়া আছে, এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে গেল-গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালুতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক্, তাহার হাতে ভাত পর্য্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে— ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়া সকলের মুখেই ঐ এক কথা! অ্যাঁ— এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতে-ছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে! নইলে পর

নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ী লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁর কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে!

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম তাহা মনে করিলে আমি আজিও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নাল্‌তের মিত্তির বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশবারো জন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়ীতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙ্গা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে-

মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ সুরু করিলেন। বলা বাহুল্য জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধকরি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এম্‌নি, যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না ; চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো!

খুড়া বলিলেন, তবেরে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীর দর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটা—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্ত্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে স্ত্রীলোক দুর্ব্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ

কুসংস্কার মানে না! আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা' সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল, এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

'চলিলাম' বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু, কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্ব্বলতা

ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে, এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি, সেও কিছুতে মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু, আমার কথা যাক্।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ, বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য্য প্রকাশ করি, যে, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া, অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিত, তা' হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না! আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা,—এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক্ না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক্ না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সেতো আর সত্যসত্যই মাপ করা যায় না! তা' নইলে পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণচিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-

হাঁটা বিদ্যা যে-সব ছেলের পেটে, তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার, এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক্, ছোটবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যে, গ্রামের বারওয়ারী পূজা-বাবত দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণদের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাশ দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে আসিতে অনেকেই, দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত, কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক, তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন!

কিন্তু যাক্। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া, গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্ম্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারে পূরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবে মাত্র সন্ন্যাসী-গিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ দুই দূরের মাল-পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটীরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁথির মালা,—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জ্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের

ছেলে মেত্‌রাণী বিবাহ করিয়া মেতর হইয়া গেছে, এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি-কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভাল কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে,—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই-ভিন্ন আর-কিছু ছিল! কিন্তু, সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাইত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এম্‌নিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না! যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে! অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্! ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার-চর্চ্চা

করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে আমি কোনমতেই ভুলিতে পারিনা দেশের নব্বুই জন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ, এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাইই। যাক্। বলিতেছিলাম যে দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুসি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগ্‌লালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেল্‌ত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে এ কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ ধরার বায়না আছে, এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক! আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ, এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়-বান্দা হইয়া উঠিলাম যে মাসখানেকের মধ্যে আমাকে সাগ্‌রেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল, এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে,

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট পালট্ পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে!

ইহার মানে যে কি তাহা আমি জানিনা। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু, যতদিন না হইল, ততদিন, সাপ ধরার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে সে ত ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু, বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া কোরো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা আমি এমনি অবহেলার সহিত করিতে সুরু করিয়াছিলাম যে সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে সাপ ধরাও কঠিন নয়

এবং ধরা সাপ দুই চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভাণ করে, ভয় দেখায় কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সব চেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রী করা,—যা দেখাইবা মাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড়ই দেখানো হোক আর একটা কাঠিই দেখানো হোক সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখো, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুকগে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছি মিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি।

সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত। আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এম্‌নি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সাম্‌লাইতে পারিত না। আর আমার ত এক রকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথাও ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সে দিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ী সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্ত্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে,—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখ্‌চ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনিতে পারে?

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই, আমি বল্‌চি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্ম্মান্তিক ভাবেই সে দিন ফলিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ—করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ, সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি।

পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া, আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল, এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্দ্ধে আর উঠিবে না। এবং, আমার সেই, "বিষ-হরির আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিয়া গেল, এবং অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু, মিনিট পোনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া নাকে কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটীর উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্ত্তী আরও দুই-চারি জন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো বা এক সঙ্গে, কখনো বা আলাদা তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন চার জন রোজা মিলিয়া, বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে, সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সে দিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধস্তা-ধস্তির পরে, রোগী তাহার বাপমায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক্, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব, যে, সে সাত দিনের বেশি আর বাঁচিয়া-থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু এক-দিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রহিল, এ সব তুমি আর কখনো কোরো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরীর আজ্ঞা! কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙ্গালীর বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু, যেখানেই যাক্, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন, ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এই মাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাতমৃত্যু হবে ত হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না তাতে ত তেমন আসে যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হোতো। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মোলো, আমার পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ্‌রে! এর কি আর প্রাশ্চিত্তি আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল, তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব্ব-প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া,

আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক Contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতী-লোক তাঁরা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু, সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত, শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইঁহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নয়।

এই বস্তুটাই এদেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁরা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর

অতগুলা বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কথনই বলিব না, টি ঁকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়; এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টি ঁকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব, যে বড় লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে-চোখে এবং কোলে-কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু, একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু'এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

মামলার ফল

বুড়া বৃন্দাবন সামন্তর মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া লড়াই করিয়া মাস ছয়েক একান্নে এক বাটীতে কাটাইল, তাহার পরে একদিন পৃথক্ হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরী মশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাষ-বাস, জমি-জমা, পুকুর বাগান, সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোট ভাই শম্ভু সুমুখের পুকুরের ওধারে খান দুই মাটির ঘর তুলিয়া ছোট-বৌ এবং ছেলেপুলে লইয়া বাস্ত ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পাইল না। কারণ শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরী মশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই! ঘরদোর সব পুরোনো হয়েছে, চালের বাতা-বাকারি বদ্‌লাতে খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাঁয়ে কার কাছে চাইতে যাবো বলুন?

শম্ভু প্রতিবাদের জন্য উঠিয়া বড় ভায়ের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, আহা ওঁর ঘরের খোঁটাখুঁটিতেই বাঁশ চাই,—আর আমার ঘরে কলাগাছ চিরে দিলেই হবে, না? সে হবে না? সে হবে না, চৌধুরী মশাই, বাঁশঝাড়টা আমার না থাক্‌লেই চল্‌বেনা তা বলে দিচ্চি।

মীমাংসা ঐ পর্য্যন্তই হইয়া রহিল। সুতরাং, এই সম্পত্তিটা রহিল দুই সরিকের। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেও শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে, এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া হাঁটিলেও শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।

সেদিন সকালে এই বাঁশঝাড় উপলক্ষ করিয়াই উভয় পরিবারের তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ষষ্ঠিপূজা কিংবা এম্‌নি কি একটা দৈবকার্য্যে বড় বৌ গঙ্গামণির কিছু বাঁশপাতার আবশ্যক ছিল। পল্লীগ্রামে এ বস্তুটি দুর্ল্ভ নয়, অনায়াসে অন্যত্র সংগ্রহ হইতে পারিত কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাঁহার সরম বোধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার মনে ভরসা ছিল, দেবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাঠে গিয়াছে,— ছোট বৌ একা আর করিবে কি!

কিন্তু কি কারণে শম্ভুর সেদিন মাঠে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে সবে মাত্র পান্তা ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এম্নি সময়ে ছোট বৌ পুকুর ঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শম্ভুর কোথায় রহিল জলের ঘটি,—কোথায় রহিল হাত মুখ ধোওয়া, সে রৈ-রাই শব্দে সমস্ত পাড়াটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো হাতেই পাতা কয়টি কাড়িয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাজের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে সকল সে আর যেখানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণের লক্ষণ চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এদিকে বড় বৌ কাঁদিতে-কাঁদিতে বাড়ী গিয়া মাঠে স্বামীর নিকট খবর পাঠাইয়া দিল। শিবু লাঙল ফেলিয়া কাস্তে হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং বাঁশঝাড়ের অদূরে দাঁড়াইয়া অনুপস্থিত কনিষ্ঠের উদ্দেশে অস্ত্র ঘুরাইয়া চীৎকার করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া দিল যে, ভিড় জমিয়া গেল। তাহাতেও যখন ক্ষোভ মিটিল না, তখন সে জমীদার বাড়ীতে নালিশ করিতে গেল, এবং এই বলিয়া শাসাইয়া গেল যে, চৌধুরী মশাই

এর বিচার করেন, ভালই, না হইলে সে সদরে গিয়া একনম্বর রুজু করিবে,—তবে তাহার নাম শিবু সামন্ত।

ওদিকে শম্ভু বাঁশপাতা কাড়ার কর্ত্তব্যটা শেষ করিয়াই মনের সুখে হাল-গরু লইয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর নিষেধ শুনে নাই। বাটীতে ছোট বৌ একা। ইতিমধ্যে ভাশুর আসিয়া চীৎকারে পাড়া জড় করিয়া বীরদর্পে এক তরফা জয়ী হইয়া চলিয়া গেলেন, ভাদ্রবধূ হইয়া সে সমস্ত কাণে শুনিয়াও একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না। ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিমানের অবধি রহিল না। সে রান্নাঘরের দিকেও গেল না, বিরস মুখে দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

শিবুর বাড়ীতেও সেই দশা। বড় বৌ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। হয় সে ইহার একটা বিহিত করুক, নয় সে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। দুটা বাঁশপাতার জন্য দেওরের হাতে এত লাঞ্ছনা!

বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তখনও শিবুর দেখা নাই। বড় বৌ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, কি জানি চৌধুরী মশাইয়ের

বাটী হইতেই বা তিনি নম্বর রুজু করিতে সোজা সদরে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় বাহিরের দরজায় ঝনাৎ করিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া শম্ভুর বড় ছেলে গয়ারাম প্রবেশ করিল। বয়স তাহার ষোল-সতেরো, কিংবা এম্‌নি একটা কিছু। কিন্তু এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাষাটা তাহার বাপকেও ডিঙাইয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের মাইনর ইস্কুলে পড়ে। আজকাল মর্ণিংইস্কুল, বেলা সাড়ে দশটায় ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে।

গয়ারামের যখন এক বৎসর বয়স, তখন তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তাহার পিতা শম্ভু পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিল বটে, কিন্তু এই মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিবার দায় জ্যাঠাইমার উপরেই পড়িল, এবং এতকাল দুই ভাই পৃথক্ না হওয়া পর্য্যন্ত এ ভার তিনিই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। বিমাতার সহিত তাহার কোন দিনই বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না,—এমন কি তাহারা নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়ার পরেও গয়ারাম যেখানে যেদিন সুবিধা পাইত, আহার করিয়া লইত।

আজ সে ইস্কুলের ছুটীর পর বাড়ী ঢুকিয়া বিমাতার মুখ

এবং আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ এ বাড়ীতে আসিতেছিল। জ্যাঠাইমার মুখ দেখিয়া তাহার সেই আগুনে জল পড়িল না, কেরোসিন পড়িল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, ভাত দে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কথা কহিলেন না, যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া রহিলেন।

ক্রুদ্ধ গয়ারাম মাটীতে একটা পা ঠুকিয়া বলিল, ভাত দিবি, না, দিবিনে, তা বল্?

গঙ্গামণি সক্রোধে মুখ তুলিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোর জন্যে ভাত রেঁধে বসে আছি,—তাই দেব। বলি, তোর সৎমা আবাগী ভাত দিতে পারলেনা যে, এখানে এসেছিস্ হাঙ্গামা করতে?

গয়ারাম চেঁচাইয়া বলিল, সে আবাগীর কথা জানিনে। তুই দিবি কিনা বল্? না দিবি ত চল্লুম আমি তোর সব হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে দিতে। বলিয়া সে গোলার নীচে চ্যালা-কাঠের গাদা হইতে একটা কাঠ তুলিয়া সবেগে রন্ধনশালার অভিমুখে চলিল।

জ্যাঠাইমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—গয়া!

হারামজাদা দস্যি! বাড়াবাড়ি করিস্‌নি বল্‌ছি। দুদিন হয়নি আমি নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি কেড়েছি, একটা কিছু ভাঙ্‌লে তোর জ্যাঠাকে দিয়ে তোর একখানা পা যদি না ভাঙাই, ত তখন বলিস্ হাঁ।

গয়ারাম রান্নাঘরের শিকলটায় গিয়া হাত দিয়াছিল, হঠাৎ একটা নূতন কথা মনে পড়ায় সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা, ভাত না দিস্ না দিবি! আমি চাইনে। নদীর ধারে বটতলায় বামুনদের মেয়েরা সব ধামা ধামা চিঁড়ে মুড়কি নিয়ে পূজো করচে, যে চাইচে, দিচ্চে, দেখে এলুম। আমি চল্‌লুম তেনাদের কাছে।

গঙ্গামণির তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ অরণ্যষষ্ঠী, এবং এক মুহূর্ত্তেই তাঁহার মেজাজ কড়ি হইতে কোমলে নামিয়া আসিল। তথাপি মুখের জোর রাখিয়া কহিলেন, তাই যা'না। কেমন যেতে পাস্ দেখি!

দেখিস্ তখন, বলিয়া গয়া একখানা ছেঁড়া গামছা টানিয়া লইয়া সেটা কোমরে জড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই গঙ্গামণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে পরের ঘরে চেয়ে খেলে তোর কি দুর্গতি করি, তা দেখিস্ হতভাগা।

গয়া জবাব দিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া এক খাম্‌চা তেল লইয়া মাথায় ঘসিতে ঘসিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া জ্যাঠাইমা উঠানে নামিয়া আসিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন, দস্যি কোথাকার! ঠাকুর দেবতার সঙ্গে গোঁয়ারতুমি! ডুব দিয়ে ফিরে না এলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি। আজ আমি রেগে রয়েচি।

কিন্তু গয়ারাম ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু দাঁত বাহির করিয়া জ্যাঠাইমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গঙ্গামণি তাহার পিছনে পিছনে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে কার ছেলে ভাত খায় যে, তুই ভাত খেতে চাস্? পাটালি গুড়ের সন্দেশ দিয়ে, চাঁপা কলা দিয়ে, দুধ দই দিয়ে ফলার করা চলে না যে, তুই যাবি পরের ঘরে চেয়ে খেতে? কৈবতের ঘরে তুমি এম্‌নি নবাব জন্মেছ?

গয়া কিছু দূরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে তুই দিলিনি কেন পোড়ারমুখি? কেন বল্‌লি নেই?

গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, শোন

কথা ছেলের! কখন্ আবার বল্লুম তোকে কিছু নেই? কোথায় চান, কোথায় কি, দস্যির মত ঢুকেই বলে দে ভাত। ভাত কি আজ খেতে আছে যে, দেব? আমি বলি, সবই ত মজুদ, ডুবটা দিয়ে এলেই—

গয়া কহিল, ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাগীরা ঝগড়া ক'রে রান্নাঘরের শেকল টেনে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাক্‌বে, আর রোজ আমি তিনপোর বেলায় ভাতে ভাত খাবো? যা আমি তোদের কারুর কাছে খেতে চাইনে—বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া গঙ্গামণি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ কাঁদ গলায় চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে কারো কাছে চেয়ে খেয়ে অমঙ্গল করিস্‌নে গয়া,—লক্ষ্মী বাপ আমার—না হয় চারটে পয়সা দেবোরে—শোন্—

গয়ারাম ভ্রূক্ষেপও করিল না, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। বলিতে বলিতে গেল, চাইনে আমি ফলার, চাইনে আমি পয়সা। তোর ফলারে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে গঙ্গামণি বাড়ী ফিরিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে নির্জ্জীবের মত দাওয়ার উপর বসিয়া

হচ্চে। আর যদি কখন হারামজাদাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিস্‌ ত তোর অতি বড় দিব্যি রইল।

পাঁচু বলিল, দিদি, তোমাদের কি, আমারই সর্ব্বনাশ। কখন রাত ভিতে লুকিয়ে আমার ঠ্যাঙেই ও ঠ্যাঙা মার্‌বে দেখ্‌ছি!

শিবু কহিল, কাল সকালেই যদি না পুলিশ পেয়াদা দিয়ে ওর হাতে দড়ি পরাই ত আমার—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

গঙ্গামণি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভীতু পাঁচকড়ি সে রাত্রে আর বাড়ী গেল না। এইখানেই শুইয়া রহিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্রোশ দুই দূরের পথ হইতে দারোগা বাবু উপযুক্ত দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া পাল্কী চড়িয়া কনেষ্টবল ও চৌকিদারাদি সমভিব্যাহারে সরজমিনে তদন্ত করিতে উপস্থিত হইলেন। অনধিকার প্রবেশ, জিনিসপত্র তছ্‌রুপাত, চ্যালা কাঠের দ্বারা স্ত্রীলোকের অঙ্গে প্রহার—ইত্যাদি বড় বড় ধারার অভিযোগ—সমস্ত গ্রামময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

প্রধান আসামী গয়ারাম—তাহাকে কৌশলে ধরিয়া

আনিয়া হাজির করিতেই, সে কনেষ্টবল, চৌকিদার প্রভৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেউ দেখতে পারে না ব'লে আমাকে ফাটকে দিতে চায়। দারোগা বুড়া মানুষ। তিনি আসামীর বয়স এবং কান্না দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে না গয়ারাম ?

গয়া কহিল, আমাকে শুধু আমার জ্যাঠাইমা ভালবাসে আর কেউ না।

দারোগা প্রশ্ন করিল, তবে জ্যাঠাইমাকে মেরেচ কেন ?

গয়া বলিল, না মারিনি। কবাটের আড়ালে গঙ্গামণি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া কহিল, তোকে আমি কখন মেরেচি জ্যাঠাইমা ?

পাঁচু নিকটে বসিয়াছিল, সে একটু কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দিদি, হুজুর জিজ্ঞাসা করচেন, সত্যি কথা বল। ও কাল দুপুরবেলা বাড়ী চড়াও হ'য়ে—কাঠের বাড়ি তোমাকে মারিনি ? ধর্ম্মাবতারের কাছে যেন মিথ্যা কথা বোল না।

গঙ্গামণি অস্ফুটে যাহা কহিলেন, পাঁচু তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিল, হাঁ, হুজুর, আমার দিদি বলচেন, ও মেরেচে।

গয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—ত্যাখ্ পেঁচো, তোর আমি না পা ভাঙি ত—রাগে কথাটা তার সম্পূর্ণ হইতে পাইল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখ্‌লেন, হুজুর! দেখ্‌লেন—! হুজুরের সুমুখেই বল্‌ছে পা ভেঙে দেবে,—আড়ালে ও খুন করতে পারে। ওকে বাঁধবার হুকুম হোক্।

দারোগা শুধু একটু হাসিলেন। গয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমার মা নেই তাই! নইলে—এ বারেও কথাটা তাহার শেষ হইতে পারিল না। যে মাকে তাহার মনেও নাই, মনে করিবার কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় আসামী শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রমাণ হইল না। দারোগাবাবু আদালতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়া রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু মামলা চালানো, তাহার যথারীতি তদ্বিরাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহার ভগিনীর প্রতি গুরুতর অত্যাচারের জন্য গয়ার যে কঠিন শাস্তি হইবে এই কথা চতুর্দ্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু গয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিবু
এই আচরণে অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিল। শিবু তাহাদে
সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু শিবুর স্ত্রী
একেবারে চুপচাপ! সেদিন গয়ার দূর সম্পর্কের এক মাস
খবর শুনিয়া শিবুর বাড়ী বহিয়া তাহার স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তা
বলিয়া গালিগালাজ করিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গামণি একেবা
নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। শিবু পাশের বাড়ীর লোকের কা
এ কথা শুনিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীকে কহিল, তুই চুপ ক
রইলি? একটা কথাও বল্‌লিনে?

শিবুর স্ত্রী কহিল, না।

শিবু বলিল, আমি বাড়ী থাক্‌লে মাগীকে ঝাঁটা পে
করে ছেড়ে দিতুম।

তাহার স্ত্রী কহিল, তাহ'লে আজ থেকে বাড়ীতেই ব'
থেকো, আর কোথাও বেরিও না। বলিয়া নিজের কা
চলিয়া গেল।

সেদিন দুপুরবেলায় শিবু বাড়ী ছিল না। শম্ভু আসি
বাঁশঝাড় হইতে গোটা কয়েক বাঁশ কাটিয়া লইয়া গেল।
শুনিয়া শিবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল। কি

বাধা দেওয়া দূরে থাকুক আজ সে কাছেও ঘেঁসিল না, নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গেল। দিন দুই পরে সংবাদ শুনিয়া শিবু লাফাইতে লাগিল। স্ত্রীকে আসিয়া কহিল, তুই কি কানের মাথা খেয়েছিস্? ঘরের পাশ থেকে সে বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, আর তুই টের পেলিনি?

তাহার স্ত্রী বলিল, কেন টের পাব না, আমি চোখেই ত' সব দেখিচি!

শিবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তবু আমাকে তুই— জানালিনে?—

গঙ্গামণি বলিল, জানাবো আবার কি? বাঁশঝাড় কি তোমার একার? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ নেই?

শিবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শুধু কহিল, তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?

সেদিন সন্ধ্যার পর পাঁচু সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্তভাবে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। শিবু গরুর জন্য খড় কুচাইতেছিল, অন্ধকারে তাহার মুখের চোখের চাপা হাসি লক্ষ্য করিল না—সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো?

পাঁচু গাম্ভীর্য্যের সহিত একটু হাস্য করিয়া কহিল, পাঁচু

থাক্‌লে যা হয় তাই! ওয়ারিণ্‌ বের করে তবে আস্‌চি। এখন কোথায় আছে জান্‌তে পারলেই হয়।

শিবুর কি একপ্রকার ভয়ানক জিদ্‌ চড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, যত খরচ হোক্‌, ছোঁড়াকে ধরাই চাই। তাকে জেলে পুরে তবে আমার অন্য কাজ। তারপরে উভয়ের নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, ভিতর হইতে আহারের আহ্বান আসে না দেখিয়া শিবু আশ্চর্য্য হইয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী মেজের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবার হ'য়ে গেছে ত আমাদের ডাকিস্‌নি কেন?

গঙ্গামণি ধীরে সুস্থে পাশ ফিরিয়া বলিল, কে রাঁধ্‌লে যে খাবার হ'য়ে গেছে?

শিবু তর্জ্জন করিয়া প্রশ্ন করিল, রাঁধিস্‌নি এখনো?

গঙ্গামণি কহিল, না। আমার শরীর ভাল নেই, আজ আমি পার্ব্ব না। নিদারুণ ক্ষুধায় শিবুর নাড়ী জ্বলিতেছিল, সে আর সহিতে পারিল না। শায়িত স্ত্রীর পিঠের উপর একটা

লাথি মারিয়া বলিল, আজকাল রোজ অসুখ, রোজ পার্ব্বো না! পার্‌বিনে ত বেরো আমার বাড়ী থেকে।

গঙ্গামণি কথাও কহিল না, উঠিয়াও বসিল না। যেমন শুইয়াছিল, তেম্‌নি পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে শালা ভগিনীপতি কাহারও খাওয়া হইল না।

সকালবেলা দেখা গেল, গঙ্গামণি বাটীতে নাই। এদিকে ওদিকে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাঁচু কহিল, দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ী চলে গেছে।

স্ত্রীর এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু শিবু মনে মনে বুঝিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরক্তিও যেমন উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, নালিশ মকদ্দমার প্রতি ঝোঁকও তেমনি খাটো হইয়া আসিতেছিল। সে শুধু বলিল, "চুলোয় যাক্, আমার খোঁজবার দরকার নেই।

বিকালবেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গামণি বাপের বাড়ী যায় নাই। পাঁচু ভরসা দিয়া কহিল, তাহ'লে নিশ্চয় পিসীমার বাড়ী চ'লে গেছেন।

তাহাদের এক বড়লোক পিসী ক্রোশ পাঁচ ছয় দূরে একটা গ্রামে বাস করিতেন। পূজা পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে

গঙ্গামণিকে লইয়া যাইতেন। শিবু স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে মুখে বলিল বটে, 'যেখানে খুসি যাক্‌গে! মরুক্‌গে!' কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবুও রাগের উপর দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গেল। এদিকে কাজ-কর্ম্ম লইয়া, গরুবাছুর লইয়া সংসার তাহার একপ্রকার অচল হইয়া উঠিল। একটা দিনও আর কাটে না এম্‌নি হইল।

সাত দিনের দিন সে আপনি গেল না বটে, কিন্তু নিজের পৌরুষ বিসর্জ্জন দিয়া, পিসীর বাড়ীতে গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

পরদিন শূন্য গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সেখানে কেহ নাই। শিবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সারাদিন স্নানাহার নাই, মড়ার মত একটা তক্তাপোষের উপর পড়িয়াছিল, পাঁচু অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সামন্ত মশাই, সন্ধান পাওয়া গেছে!

শিবু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায়? কে খবর দিল? অসুখ বিসুখ কিছু হয়নি ত? গাড়ী নিয়ে চল্‌না এখুনি দু'জনে যাই।

পাঁচু বলিল, দিদির কথা নয়—গয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু আবার শুইয়া পড়িল, কোন কথা কহিল না।

তখন পাঁচু বহুপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে, এ সুযোগ কোনও মতে হাতছাড়া করা উচিত নয়। দিদি ত একদিন আস্‌বেই, কিন্তু তখন আর এ ব্যাটাকে বাগে পাওয়া যাবে না। শিবু উদাস কণ্ঠে কহিল, এখন থাক্‌গে পাঁচু! আগে সে ফিরে আসুক্‌—তার পরে—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, তার পরে কি আর হবে, সামন্ত মশাই? বরঞ্চ দিদি ফিরে আস্‌তে না আস্‌তে কাজটা শেষ করা চাই। সে এসে পড়্‌লে হয়ত আর হবেই না।

শিবু রাজি হইল। কিন্তু আপনার খালি ঘরের দিকে চাহিয়া পরের উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোন মতেই নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখন পাঁচুর জোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।

পরদিন রাত্রি থাকিতেই তাহারা আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে পাঁচু জানাইল, বহু দুঃখে খবর পাওয়া গেছে, শম্ভু তাহাকে পাঁচলার সরকারী পুলের কাজে নাম ভাঁড়াইয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে—সেই খানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

শিবু বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, তখনও চুপ করিয়া রহিল।

তাহারা গ্রামে যখন প্রবেশ করিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রামের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ, লোকজন, লোহা লক্কড়, কল-কারখানায় পরিপূর্ণ—সর্ব্বত্রই ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া জন-মজুরেরা বাস করিতেছে—অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন কহিল, যে ছেলেটি সাহেবের বাঙলা লেখাপড়ার কাজ করচে, সেত? তার ঘর ঐ যে—বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র কুটীর দেখাইয়া দিলে তাহারা গুঁড়ি মারিয়া পা টিপিয়া অনেক কষ্টে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গয়ারামের গলা শুনিতে পাওয়া গেল। পাঁচু পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া পেয়াদা এবং শিবুকে লইয়া বীরদর্পে অকস্মাৎ কুটীরের উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তাহার সমস্ত মুখ বিস্ময়ে, ক্ষোভে, নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার দিদি ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়ারাম ভোজনে বসিয়াছে।

শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথায় আঁচলটা তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসোগে, আমি ততক্ষণ আর এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।

সম্পূর্ণ।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ,
ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত-গুলি একত্র বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ও লইতে পারেন।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, **"গ্রাহক-নম্বর"** সহ পত্র দিতে হইবে।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ।
৩। **পল্লীসমাজ** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সং)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ।
৫। **বিবাহবিপ্লব** (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৬। **চিত্রালী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। শাশ্বত-ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ।
৯। বড় বাড়ী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষণীয়া (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। সকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। সুখের ঘর (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরাজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী—শ্রীজলধর সেন।
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম, এ।
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। ভবানী—নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল্।
৪৮। ছবি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু। (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।